سورة الفجر

সূরা ফজর

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৩০ আয়াত ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝٤ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ
قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝٥ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧
الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩
وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۝١٠ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝١١ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝١٢
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤ فَاَمَّا
الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ۝١٥
وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ۝١٦ كَلَّا بَلْ
لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۝١٧ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝١٨ وَتَاْكُلُوْنَ
التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۝١٩ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝٢٠ كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا
دَكًّا ۝٢١ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝٢٢ وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ
يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۝٢٣ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ۝٢٤
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۝٢٥ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ۝٢٦ يٰٓاَيَّتُهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝٢٧ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝٢٨ فَادْخُلِيْ فِيْ
عِبٰدِيْ ۝٢٩ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝٣٠

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) শপথ ফজরের, (২) শপথ দশ রাত্রির, (৩) শপথ তার, যা জোড় ও যা বেজোড় (৪) এবং শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে, (৫) এর মধ্যে আছে শপথ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে। (৬) আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, (৭) যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং (৮) যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি (৯) এবং সামুদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল (১০) এবং বহু কীলকের অধিপতি ফেরাউনের সাথে, (১১) যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল। (১২) অতঃপর সেখানে বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। (১৩) অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশা-ঘাত করলেন। (১৪) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (১৫) মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলেঃ আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন (১৬) এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলেঃ আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। (১৭) এটা অমূলক বরং তোমরা এতীমকে সম্মান কর না (১৮) এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না (১৯) এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল (২০) এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভাল-বাস। (২১) এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে (২২) এবং আপনার পালন-কর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন, (২৩) এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে? (২৪) সে বলবেঃ হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম! (২৫) সেদিন তার শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিবে না (২৬) এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দেবে না। (২৭) হে প্রশান্ত মন, (২৮) তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। (২৯) অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও (৩০) এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ ফজরের সময়ের এবং (যিলহজ্জের) দশ রাত্রির (অর্থাৎ দশদিনের। এই দিনগুলোর ফযীলত অনেক)। শপথ তার যা জোড় ও যা বেজোড়। (জোড় বলে যিল-হজ্জের দশম তারিখ এবং বেজোড় বলে নবম তারিখ বোঝানো হয়েছে। অন্য এক হাদীসে আছে যে, এর অর্থ নামায। কোন নামাযের রাক'আত জোড় এবং কোন নামাযের রাক'আত বেজোড়। প্রথম রেওয়ায়েতকে বর্ণনা ও অর্থ উভয় দিক দিয়ে অধিক সহীহ্ বলা হয়েছে। কারণ, এই সূরায় সময়েরই শপথ করা হয়েছে। সুতরাং জোড় ও বেজোড়ও সময়েরই শপথ হওয়া সঙ্গত। এরূপও বলা যায় যে, জোড় ও বেজোড় বলে যা যা সম্মা-নার্হ, তাই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় সময়ও এর অন্তর্ভুক্ত এবং নামাযের রাক'আতও

দাখিল)। শপথ রাত্রির, যখন তা গত হতে থাকে (যেমন অন্য আয়াতে আছে وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ---অতঃপর এই শপথটি যে মহান, মধ্যবর্তী বাক্যে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে) এর মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট শপথ আছে কি? [এ প্রশ্নের অর্থ আরও জোরদার করা অর্থাৎ উল্লিখিত শপথগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি শপথ বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য যথেষ্ট। কোরআনে উল্লিখিত সব শপথই এ ধরনের কিন্তু গুরুত্ব বোঝাবার জন্য এ শপথের যথেষ্টতা পরিষ্কার বর্ণিত হয়েছে। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ শপথের উহ্য জওয়াব এই যে, কাফিরদের অবশ্যই শাস্তি হবে। পরবর্তী শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত থেকে একথা বোঝা যায়।---(জালালাইন)] আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আ'দ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং সারা বিশ্বের শহরসমূহে শক্তি ও বলবীর্যে যাদের সমান কোন লোক সৃজিত হয়নি? [এ সম্প্রদায়ের দুটি উপাধি ছিল আদ ও ইরাম। আ'দ আসের, আস্ ইরামের এবং ইরাম ছিল নূহ-তনয় সামের পুত্র। সুতরাং, কখনও তাদেরকে পিতার নামে আ'দ বলা হয়, আবার কখনও দাদার নামে ইরাম বলা হয়। ইরামের অপর পুত্র ছিল আবের এবং আবেরের পুত্র ছিল সামূদ। এই নামে একটি বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অতএব, আ'দ আসের মধ্যস্থতায় এবং সামূদ আ'বেরের মধ্যস্থতায় ইরামের সাথে মিলিত হয়ে যায়। আয়াতে আ'দের সাথে ইরামকে যুক্ত করার কারণ এই যে, আ'দ বংশের দুটি স্তর রয়েছে---পূর্ববর্তী যাদেরকে প্রথম আ'দ বলা হয় এবং পরবর্তী, যাদেরকে দ্বিতীয় আ'দ বলা হয়। ইরাম শব্দ যোগ করায় ইঙ্গিত হয়ে গেল যে, এখানে প্রথম আ'দ বোঝানো হয়েছে। কেননা, কম মধ্যস্থতার কারণে ইরাম শব্দের অর্থ প্রথম আ'দই হয়ে থাকে---(রূহুল মা'আনী) অতঃপর অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত উম্মতের কথা বলা হয়েছে যে, আপনি কি লক্ষ্য করেননি]---সামূদ গোত্রের সাথে (কি আচরণ করেছেন) যারা কোরা উপত্যকায় (পাহাড়ের) পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। ('ওয়াদিউল কোরা' তাদের একটি শহরের নাম; যেমন অপর এক শহরের নাম ছিল 'হিজর'। এগুলো সবই হেজায ও শামের মধ্যস্থলে অবস্থিত সামূদ গোত্রের বাসস্থান)। এবং কীলকের অধিপতি ফিরাউনের সাথে।---(দূররে মনসূরে বর্ণিত আছে ফিরাউন যাকে শাস্তি দিত তার চার হাত-পায়ে কীলক এঁটে দিয়ে শাস্তি দিত। অতঃপর সব সম্প্রদায়ের অভিন্ন অপরাধ উল্লেখ করা হয়েছে---) যারা শহরসমূহে গর্বিত মস্তক উঁচু করে রেখেছিল এবং তথায় বিস্তর অশান্তি বিরাজ করেছিল। অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশাঘাত করলেন। (অর্থাৎ আযাব নাযিল করলেন। এখানে আযাবকে চাবুকের সাথে এবং নাযিল করাকে আঘাত করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর এই শাস্তির

কারণ এবং উপস্থিত কাফিরদের শিক্ষার জন্য ইরশাদ হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা (অবাধ্যদের প্রতি) সতর্ক দৃষ্টি রাখেন (ফলে উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলোকে তো ধ্বংস করে দিয়েছেনই এবং বর্তমান লোকদেরকেও আযাব দেবেন)। অতএব (এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান কাফিরদের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আযাব ডেকে আনে, এমন কর্ম থেকে বেঁচে থাকা উচিত ছিল কিন্তু কাফির) মানুষ যে, (যে কর্মই তারা অবলম্বন করে সেগুলোর উৎস দুনিয়াপ্রীতি ; সেমতে তাকে তার পালনকর্তা পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন (যেমন, ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি দেন, যার উদ্দেশ্য তার কৃতজ্ঞতা যাচাই করা) তখন সে (একে তার প্রাপ্য বলে মনে করে গর্বে ও অহংকারভরে) বলে, আমার পালনকর্তা আমার সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ আমি তাঁর প্রিয়পাত্র বলেই আমাকে এমন সব নিয়ামত দান করেছেন)। এবং যখন তাকে (অন্যভাবে) পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, (যার উদ্দেশ্য তার সবর ও সন্তুষ্টি যাচাই করা) তখন সে (অভিযোগের সুরে) বলে ঃ আমার পালনকর্তা আমার সম্মান হ্রাস করেছেন। (অর্থাৎ আমি সম্মানের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ইদানিং আমাকে হেয় করে রেখেছেন। ফলে পার্থিব নিয়ামতও হ্রাস পেয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কাফির দুনিয়াকেই মূল লক্ষ্য মনে করে। ফলে এর স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রিয়পাত্র হওয়ার প্রমাণ এবং নিজেকে এর যোগ্য পাত্র বিবেচনা করে। পক্ষান্তরে এর দুঃখকষ্টকে বিতাড়িত হওয়ার দলীল এবং নিজেকে এর পাত্র নয় বলে মনে করে। সুতরাং কাফির ব্যক্তি দুটি ভুল করে—এক. দুনিয়াকে মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করা। এ থেকে পরকালে অবিশ্বাস জন্মলাভ করে। দুই. যোগ্যপাত্র হওয়ার দাবী করা। এথেকে গর্ব, অহংকার অকৃতজ্ঞতা, বিপদে হতাশা এবং ধৈর্যহীনতা জন্মলাভ করে। এগুলো সব আযাবের কারণ)। কখনই এরূপ নয়। (অর্থাৎ দুনিয়া মূল লক্ষ্য নয় এবং দুনিয়া থাকা না থাকা প্রিয়পাত্র অথবা অপ্রিয়পাত্র হওয়ার দলীল নয়। কেউ কোন সম্মানের যোগ্য নয় এবং সবর ও কৃতজ্ঞতা ওয়াজিব হওয়ার গণ্ডি থেকে কেউ মুক্ত নয়। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কেবল এসব কর্মই আযাবের কারণ নয়) বরং (তোমাদের মধ্যে আরও অনেক কর্ম নিন্দনীয়, অপছন্দনীয় ও আযাবের কারণ রয়েছে। সেমতে) তোমরা এতীমকে সম্মান কর না (অর্থাৎ এতীমকে লাঞ্ছিত কর এবং জুলুম করে তার ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে ফেল) এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। (অর্থাৎ অপরের প্রাপ্য নিজেরাও পরিশোধ কর না এবং অপরকেও পরিশোধ করতে বল না। বস্তুত ওয়াজিব কাজ না করা কাফিরের জন্য আযাব বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। তবে কুফর ও শিরক আসল আযাবের ভিত্তি হয়ে থাকে)। তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণই কুক্ষিগত করে ফেল। (অর্থাৎ অপরের হকও খেয়ে ফেল। বর্তমান ব্যাখ্যা অনুযায়ী তখন উত্তরাধিকার মক্কায় প্রচলিত না থাকলেও ইবরাহিমী এবং ইসমাঈলী শরীয়তের উত্তরাধিকার প্রথা মক্কায় বিদ্যমান ছিল। সেমতে মূর্খতাযুগে শিশু ও কন্যাদেরকে উত্তরাধিকারের যোগ্য মনে না করা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, উত্তরাধিকার প্রথা পূর্ব থেকে বিদ্যমান ছিল। সূরা নিসায় এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে) এবং তোমরা ধনসম্পদকে খুবই ভালবাস। (উপরোক্ত

কুকর্মসমূহ এরই ফলশ্রুতি। কেননা, দুনিয়াপ্রীতিই সব পাপের মূল কারণ। সারকথা, এসব ক্রিয়াকর্মই শাস্তির কারণ। অতঃপর যারা এসব কর্মকে শাস্তির কারণ মনে করে না, তাদেরকে শাসানো হয়েছে---) কখনও এরূপ নয়। (এসব কর্ম শাস্তির কারণ অবশ্যই হবে। অতঃপর শাস্তি ও প্রতিদানের সময় বর্ণনা করা হয়েছে---) যখন পৃথিবী (অর্থাৎ পৃথিবীর সুউচ্চ অংশ, যথা পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি) চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে (ফলে ভূপৃষ্ঠ সমান্তরাল হয়ে যাবে, যেমন অন্য আয়াতে আছে لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا) এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ (হাশরের ময়দানে) সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবে। (হিসাব-নিকাশের সময় এটা হবে। আল্লাহ্ তা'আলার উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না)। এবং সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে, সেদিন মানুষ বুঝবে এবং এই বোঝা তার কি কাজে আসবে? (অর্থাৎ এখন বুঝলে তার কোন উপকার হবে না। কারণ, সেটা প্রতিদান জগৎ---কর্মজগৎ নয়)। সে বলবেঃ হায়, এ জীবনের জন্য যদি আমি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম! সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দেবে না এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দেবে না। (অর্থাৎ এমন কঠোর শাস্তি ও বন্ধন দেবেন, যা দুনিয়াতে কেউ কাউকে দেয়নি। অতঃপর আল্লাহ্র বাধ্য বান্দাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ) হে প্রশান্ত রূহ্, (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সত্যে বিশ্বাসী ছিল এবং কোন প্রকার সন্দেহ ও অস্বীকার করত না। রূহ্ সেরা অঙ্গ, তাই রূহ্ বলে ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে)। তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও এমতাবস্থায় যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। (مطمئنة শব্দের মাঝে তাদের সৎ কর্মসমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সৎকর্মের প্রতি ইঙ্গিত এবং শাস্তির কর্মসমূহের বিবরণ দানের কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে মক্কাবাসীদেরকে শোনা-নোই প্রধান উদ্দেশ্য। তখন মক্কায় এ জাতীয় কর্মের লোক বেশী ছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় পাঁচটি বস্তুর শপথ করে اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ আয়াতে বর্ণিত বিষয়-বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ দুনিয়াতে তোমরা যা কিছু করছ, তার শাস্তি ও প্রতিদান অপরিহার্য ও নিশ্চিত। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

শপথের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে ফজর অর্থাৎ সোবহে-সাদেকের সময়। এখানে প্রত্যেক দিনের প্রভাতকালও উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, প্রভাতকাল বিশ্বে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। এখানে বিশেষ দিনের প্রভাতকালও বোঝানো যেতে পারে। তফসীরবিদ সাহাবী হযরত আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়র (রা) থেকে প্রথম অর্থ এবং ইবনে আব্বাসের এক

রেওয়ায়েতে ও হযরত কাতাদাহ্ (রা) থেকে দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ মহররম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল বর্ণিত হয়েছে। এ দিনটি ইসলামী চান্দ্র বছরের সূচনা।

কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখের প্রভাতকাল। মুজাহিদ (র) ও ইকরিমা (রা)-এর উক্তি তাই। বিশেষ করে এদিনের শপথ করার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক দিনের সাথে একটি রাত্রি সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যা ইসলামী নিয়মানুযায়ী দিনের পূর্বে থাকে। একমাত্র 'ইয়াওমুন্নহ্‌র' তথা যিলহজ্জের দশম তারিখ এমন একটি দিন, যার সাথে কোন রাত্রি নেই। কারণ, এর পূর্বের রাত্রি এ দিনের রাত্রি নয় বরং আইনত তা আরাফারই রাত্রি। এ কারণেই কোন হাজী যদি 'ইয়াওমে-আরাফা' তথা নবম তারিখে দিনের বেলায় আরাফাতের ময়দানে পৌঁছতে না পারে এবং রাত্রিতে সোবহে সাদেকের পূর্বে কোন সময় পৌঁছে যায়, তবে তার আরাফাতে অবস্থান সিদ্ধ ও হজ্জ শুদ্ধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, আরাফা দিবসের রাত্রি দু'টি---একটি পূর্বে ও একটি পরে এবং 'ইয়াওমুন্নহর' তথা দশম তারিখের কোন রাত্রি নেই। এদিক দিয়ে এ দিনটি সব দিনের তুলনায় বিশেষ শানের অধিকারী।--(কুরতুবী)

শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ্ এবং মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে এতে যিলহজ্জের প্রথম দশ রাত্রি বোঝানো হয়েছে। কেননা, হাদীসে এসব রাত্রির ফযীলত বর্ণিত রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ইবাদত করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে যিলহজ্জের দশদিন সর্বোত্তম দিন। এর প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছর রোযার সমান এবং এতে প্রত্যেক রাত্রির ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমতুল্য।---(মাযহারী) হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ—এর তফসীর করেছেন, যিলহজ্জের দশদিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত মূসা (আ)-র কাহিনীতে وَاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ বলে এই দশ রাত্রিকেই বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী বলেন ঃ হযরত জাবের (রা)-এর হাদীস থেকে জানা গেল যে, যিলহজ্জের দশ দিন সর্বোত্তম দিন এবং এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মূসা (আ)-র জন্যও এই দশ দিনই নির্ধারিত করা হয়েছিল।

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ—এ দু'টি শব্দের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে 'জোড়' ও 'বেজোড়'। এই জোড় ও বেজোড় বলে আসলে কি বোঝানো হয়েছে, আয়াত থেকে নির্দিষ্টভাবে তা জানা যায় না। তাই এ ব্যাপারে তফসীরকারগণের উক্তি অসংখ্য। কিন্তু হযরত জাবের (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر—অর্থাৎ وتر-এর অর্থ আরাফা দিবস, (যিলহজ্জের নবম তারিখ) এবং شفع --এর অর্থ ইয়াওমুন্নহ্‌র (যিলহজ্জের দশম তারিখ)।

কুরতুবী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেনঃ এটা সনদের দিক দিয়ে এমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক সহীহ্, যাতে জোড় ও বেজোড় নামাযের কথা আছে। তাই হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরিমা (রা) প্রমুখ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত তফসীরই অবলম্বন করেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ জোড় বলে সমগ্র সৃষ্টজগৎ বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেনঃ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ—অর্থাৎ আমি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি ; যথা কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন, শীত ও গ্রীষ্ম, আকাশ ও পৃথিবী, জিন ও মানব এবং নর ও নারী। এগুলোর বিপরীতে বেজোড় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা সত্তার--- هُوَ اللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ

وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ—يسرى অর্থ রাত্রিতে চলা। অর্থাৎ রাত্রির শপথ, যখন সে চলতে থাকে তথা খতম হতে থাকে। এই পাঁচটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা গাফিল মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বলেছেনঃ هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ—حجر -এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেওয়া। মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান করে। তাই حجر -এর অর্থ বিবেকও হয়ে থাকে। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, বিবেকবানের জন্য এসব শপথও যথেষ্ট কি না? এই প্রশ্ন প্রকৃত পক্ষে মানুষকে গাফলতি থেকে জাগ্রত করার একটি কৌশল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে, তাঁর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করা সম্পর্কে এবং শপথের বিষয়সমূহের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়, তার নিশ্চয়তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। এখানে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়েছে, তা এই যে, মানুষের প্রত্যেক কর্মের পরকালে হিসাব হওয়া এবং তার শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। শপথের এই জওয়াব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের উপর আযাব আসার কথা বর্ণনা করেও একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহের শাস্তি পরকালে হওয়া তো স্থিরীকৃত বিষয়ই। মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও তাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি জাতির আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে---এক. আ'দ বংশ, দুই. সামূদ গোত্র এবং তিন. ফিরাউন সম্প্রদায়। আ'দ ও সামূদ জাতিদ্বয়ের বংশতালিকা উপরের দিকে ইরামে গিয়ে এক হয়ে যায়। এভাবে ইরাম শব্দটি আ'দ ও সামূদ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য। এখানে শুধু আ'দ-এর সাথে ইরাম উল্লেখ করার কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ — এখানে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে আ'দ-গোত্রের পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম আ'দকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা দ্বিতীয় আ'দের তুলনায় আ'দের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে আ'দে-ইরাম শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদেরকেই এখানে عاد ارم শব্দ দ্বারা এবং সূরা নজ্‌মে عاد الاولى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে ঃ ذَاتِ الْعِمَادِ—عماد ও عمود শব্দের অর্থ স্তম্ভ। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় জাতি ছিল বিধায় তাদেরকে ذات العماد বলা হয়েছে। এই আ'দ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কোরআন পাক তাদের এই স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছে ঃ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ অর্থাৎ এমন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী জাতি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে সৃজিত হয়নি। এতদসত্ত্বেও কোরআন তাদের দেহের মাপ অনাবশ্যক বিবেচনা করে উল্লেখ করেনি। ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহে তাদের দৈহিক গঠন ও শক্তি সম্পর্কে অদ্ভুত ধরনের কথাবার্তা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুকাতিল (র) থেকে তাদের উচ্চতা বার হাত তথা ১৮ ফুট বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য, তাঁরা ইসরাইলী রেওয়ায়েতদৃষ্টেই একথা বলেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ ইরাম আ'দ তনয় শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের নাম। এরই বিশেষণ ذات العماد—কেননা, এই অনুপম প্রাসাদটি বহু স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান এবং স্বর্ণরৌপ্য ও মণিমুক্তা দ্বারা নির্মিত ছিল, যাতে মানুষ পরকালের বেহেশতের পরিবর্তে এই নগদ বেহেশতকে পছন্দ করে নেয়। কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যখন শাদ্দাদ সভাসদ সমভিব্যাহারে এ বেহেশতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল, তখনই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হল। ফলে সবাই ধ্বংস এবং কৃত্রিম বেহেশতও ধূলিসাৎ হয়ে গেল।—(কুরতুবী) এ তফসীরের দিক দিয়ে আয়াতে আ'দ গোত্রের একটি বিশেষ আযাব বর্ণিত হয়েছে, যা শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের উপর নাযিল হয়েছে। প্রথম তফসীর অনুযায়ী এতে আ'দ গোত্রের সমস্ত আযাবের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ—اوتاد শব্দটি وتد-এর বহুবচন। এর অর্থ কীলক। ফিরাউনকে কীলকওয়ালা বলার বিভিন্ন কারণ তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এই শব্দের মধ্যে তার জুলুম-নিপীড়ন ও শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ কারণই প্রসিদ্ধ। ফিরাউন যার প্রতি কুপিত হত, তার হস্তপদ চারটি কীলকে বেঁধে অথবা চার হাতপায়ে কীলক মেরে রৌদ্রে শুইয়ে

দিত এবং তার দেহে সর্প, বিচ্ছু ছেড়ে দিত। কোন কোন তফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়ার ঈমান প্রকাশ করা এবং ফিরাউন কর্তৃক তাঁকে এ ধরনের শাস্তি দেওয়ার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।---(মাযহারী)

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ---আ'দ, সামূদ ও ফিরাউন গোত্রের অপকীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের আযাবকে কশাঘাতের শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কশাঘাত যেমন দেহের বিভিন্ন অংশে হয়, তেমনি তাদের উপরও বিভিন্ন প্রকার আযাব নাযিল করা হয়।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ---مرصد ও مرصاد শব্দের অর্থ সতর্ক দৃষ্টি রাখার ঘাঁটি, যা কোন উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। কোন কোন তফসীরবিদ এ বাক্যকে পূর্বোক্ত শপথ বাক্যসমূহের জওয়াব সাব্যস্ত করেছেন।

দুনিয়াতে জীবনোপকরণের বাহুল্য ও স্বল্পতা আল্লাহ্র কাছে প্রিয়পাত্র ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আলামত নয়ঃ فَأَمَّا الْإِنسَانُ---আয়াতে আসলে কাফির ইনসান বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সেসব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা নিম্নরূপ ধারণায় লিপ্ত থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাউকে জীবনোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, ধনসম্পদ ও সুস্বাস্থ্য দান করেন, তখন শয়তান তাকে দু'টি ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করে দেয়---এক. সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণগরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি, যা আমার লাভ করাই সঙ্গত। আমি এর যোগ্যপাত্র। দুই. আমি আল্লাহ্র কাছেও প্রিয়পাত্র। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নিয়ামত দান করতেন না। এমনিভাবে কেউ অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হলে একে আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলীল মনে করে এবং তাঁর প্রতি এ কারণে ক্রুদ্ধ হয় যে, সে অনুগ্রহ ও সম্মানের পাত্র ছিল কিন্তু তাকে অহেতুক লাঞ্ছিত ও হেয় করা হয়েছে। কাফির ও মুশরিকদের মধ্যে এ ধরনের ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং কোরআন পাক কয়েক জায়গায় তা উল্লেখও করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানও এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের অবস্থাই উল্লেখ করেছেনঃ كَلَّا---অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। দুনিয়াতে জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ্য সৎ ও আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, তেমনি অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্ছিত হওয়ার দলীল নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। খোদায়ী দাবী করা সত্ত্বেও ফিরাউনের কোনদিন

মাথা ব্যথাও হয়নি, অপরপক্ষে কোন কোন পয়গম্বরকে শত্রুরা করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। রসূলে করীম (সা) বলেছেন, মুহাজিরগণের মধ্যে যারা দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিল, তারা ধনী মুহাজিরগণ অপেক্ষা চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে যাবে।—(মাযহারী) অন্য এক হাদীসে আছে আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দাকে ভালবাসেন, তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ।—(মাযহারী)

ইয়াতীমের জন্য ব্যয় করাই যথেষ্ট নয়, তাকে সম্মান করাও জরুরী ঃ এরপর কাফিরদের কয়েকটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ—অর্থাৎ তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। এখানে আসলে বলা উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ইয়াতীমদের প্রাপ্য আদায় কর না এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন কর না। কিন্তু 'সম্মান কর না' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াতীমদের প্রাপ্য আদায় এবং তাদের ব্যয়-ভার বহন করলেই তোমাদের যৌক্তিক, মানবিক ও আল্লাহ্ প্রদত্ত ধনসম্পদের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালিত হয়ে যায় না বরং তাদেরকে সম্মানও করতে হবে ; নিজেদের সন্তানদের মুকাবিলায় তাদেরকে হেয় মনে করা যাবে না। কাফিররা যে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সম্মান এবং অভাব-অনটনকে অপমান মনে করত, এটা বাহ্যত তারই জওয়াব। এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা কোন সময় অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলে তা এ কারণে হয় যে, তোমরা ইয়াতীমের ন্যায় দয়াযোগ্য বালক-বালিকাদের প্রাপ্যও আদায় কর না। তাদের দ্বিতীয় মন্দ অভ্যাস হল ঃ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ অর্থাৎ তোমরা নিজেরা তো গরীব-মিসকীনকে অন্নদান করই না, পরন্তু অপরকেও এ কাজে উৎসাহিত কর না। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনী ও বিত্তশালীদের উপর যেমন গরীব-মিসকীনের হক আছে, তেমনি যারা দান করার সামর্থ্য রাখে না, তাদের উপরও হক আছে যে, তারা অপরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে।

তৃতীয় মন্দ অভ্যাস এই যে, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا—অর্থাৎ তোমরা হারাম ও হালাল সবরকম ওয়ারিশী সম্পত্তি একত্র করে খেয়ে ফেল এবং নিজের অংশের সাথে অপরের অংশও ছিনিয়ে নাও। সবরকম হালাল ও হারাম ধনসম্পদ একত্র করা নাজায়েয কিন্তু এখানে বিশেষভাবে ওয়ারিশী সম্পত্তির কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, ওয়ারিশী সম্পত্তির দিকে বেশী দৃষ্টি রাখা ও তার পেছনে লেগে থাকা ভীরুতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ। এ ধরনের লোক মৃতভোজী জন্তুদের মতই তাকিয়ে থাকে, কবে সম্পত্তির মালিক মরবে এবং তারা সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার সুযোগ পাবে। যারা কৃতী পুরুষ, তারা নিজেদের উপার্জনেই সন্তুষ্ট থাকে এবং মৃতদের সম্পত্তির প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করে না।

চতুর্থ মন্দ অভ্যাস হচ্ছে ঃ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا —অর্থাৎ তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবাস। অত্যধিক বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনসম্পদের ভালবাসা এক পর্যায়ে নিন্দনীয় নয় বরং মানুষের জন্মগত তাগিদ। তবে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং তাতে মজে যাওয়া নিন্দনীয়। কাফিরদের এসব মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে কিয়ামত আগমনের কথা বলা হয়েছে।

إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا —دك -এর শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে আঘাত করে ভেঙ্গে দেওয়া। এখানে কিয়ামতের ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে যা পর্বতমালাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। دَكًّا دَكًّا বারবার বলায় ইঙ্গিত হয়েছে যে, কিয়ামতের ভূকম্পন একের পর এক অব্যাহত থাকবে।

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا —অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে হাশরের ময়দানে আগমন করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে আগমন করবেন, তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ —অর্থাৎ সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে অর্থাৎ সামনে উপস্থিত করা হবে। এর উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে আনা হবে, তার স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তবে বাহ্যত বোঝা যায় যে, সপ্তম পৃথিবীর গভীরে অবস্থিত জাহান্নাম তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে এবং সব সমুদ্র অগ্নিময় হয়ে তাতে শামিল হয়ে যাবে। এভাবে জাহান্নাম হাশরের আঙিনায় সবার সামনে এসে যাবে।

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ —تذكر -এর অর্থ এখানে বুঝে আসা। অর্থাৎ কাফির মানুষ সেদিন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে তার কি করা উচিত ছিল আর সে কি করেছে। কিন্তু তখন এই বুঝে আসা নিষ্ফল হবে। কেননা পরকাল কর্ম-জগৎ নয়—প্রতিদান জগৎ। অতঃপর সে يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي বলে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে যে, হায়! আমি যদি দুনিয়াতে কিছু সৎকর্ম করতাম! কিন্তু কুফর ও শিরকের শাস্তি সামনে এসে যাওয়ার পর এ আকাঙ্ক্ষায় কোন লাভ নেই। এখন আযাব ও পাকড়াওয়ের সময়। আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াওয়ের মত কঠিন পাকড়াও কারও হতে পারে না। অতঃপর মু'মিনদের সওয়াব ও জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে।

نفس مطمئنة —এখানে মু'মিনদের রূহ্কে يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

(প্রশান্ত আত্মা) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ সে আত্মা, যে আল্লাহ্র স্মরণ ও আনুগত্যের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে এবং তা না করলে অশান্তি ভোগ করে। সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মন্দস্বভাব ও হীনমন্যতা দূর করেই এই স্তর অর্জন করা যায়। আল্লাহ্র আনুগত্য, যিকির ও শরীয়ত এরূপ ব্যক্তির মজ্জার সাথে একাকার হয়ে যায়। সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ اِرْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ ---অর্থাৎ নিজের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও। ফিরে যাওয়া বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, তার প্রথম বাসস্থানও পালনকর্তার কাছে ছিল। সেখানেই ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। এতে সে হাদীসের সমর্থন রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, মু'মিনগণের আত্মা তাদের আমলনামাসহ সপ্তম আকাশে আরশের ছায়াতলে অবস্থিত ইল্লিয়্যীনে থাকবে। সমস্ত আত্মার আসল বাসস্থান সেখানেই। সেখানে থেকে এনে মানব দেহে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং মৃত্যুর পর সেখানেই ফিরে যায়।

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً —অর্থাৎ এ আত্মা আল্লাহ্র প্রতি তাঁর সৃষ্টিগত ও আইনগত বিধি-বিধানে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা, বান্দার সন্তুষ্টির দ্বারাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট না হলে বান্দা আল্লাহ্র ফয়সালার সন্তুষ্ট হওয়ার তওফীকই পায় না। এমনি আত্মা মৃত্যুকালে মৃত্যুতেও সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من احب لقاء الله احب الله لقائه ومن كره لقاء الله كره الله لقائه

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন। এই হাদীস শুনে হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ তো মৃত্যুর মাধ্যমেই হতে পারে। কিন্তু মৃত্যু আমাদের অথবা কারও পছন্দনীয় নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আসল ব্যাপার তা নয়। প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়, যা শুনে মৃত্যু তার কাছে অত্যধিক প্রিয় বিষয় হয়ে যায়। এমনিভাবে মৃত্যুর সময় কাফিরের সামনে আযাব ও শাস্তি উপস্থিত করা হয়। ফলে তখন তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক মন্দ ও অপছন্দনীয় কোন বিষয় মনে হয় না।---(মাযহারী) সারকথা বর্তমানে যে মানুষমাত্রই মৃত্যুকে অপছন্দ করে, তা ধর্তব্য নয় বরং আত্মা নির্গত হওয়ার সময়ে যে ব্যক্তি মৃত্যুতে এবং আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً-এর মর্ম তাই।

فَادْخُلِى فِى عِبَادِى ---প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, আমার বিশেষ বান্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করা ধর্মপরায়ণ সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাদের সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। এ থেকে জানা যায় যে, যারা দুনিয়াতে ধার্মিক ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও সংসর্গ অবলম্বন করে, তারা যে তাদের সাথে জান্নাতে যাবে, এটা তারই আলামত। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আ) দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ وَاَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ এবং ইউসুফ (আ) দোয়া করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ وَاَلْحِقْنِى بِالصَّالِحِيْنَ এতে বোঝা গেল, সৎসংসর্গ একটি মহানিয়ামত, যা পয়গম্বরগণও উপেক্ষা করতে পারেন না।

وَادْخُلِى جَنَّتِى ---এতে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ 'আমার জান্নাত' বলেছেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাত কেবল চিরন্তন সুখ-শান্তির আবাসস্থলই নয় বরং সর্বোপরি এটা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির স্থান।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত মু'মিনগণকে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানসূচক এ সম্বোধন কখন হবে, সে সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেন, কিয়ামতে হিসাব-নিকাশের পর এ সম্বোধন হবে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনার দ্বারাও এর সমর্থন হয়। কারণ, পূর্বোল্লিখিত কাফিরদের আযাব কিয়ামতের পরেই হবে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মু'মিনদের প্রতি এ সম্বোধনও তখনই হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ এ সম্বোধন মৃত্যুর সময় দুনিয়াতেই হয়। অনেক হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাই ইবনে কাসীর বলেছেন ঃ উভয় সময়েই মু'মিনদের আত্মাকে এই সম্বোধন করা হবে--মৃত্যুর সময়েও এবং কিয়ামতেও।

যেসব হাদীস থেকে মৃত্যুর সময় সম্বোধন হবে বলে জানা যায়, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর হাদীস। অপর একটি হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মসনদে আহমদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন মু'মিনের মৃত্যুর সময় আসে, তখন রহমতের ফেরেশতা সাদা রেশমী বস্ত্র সামনে রেখে তার আত্মাকে সম্বোধন করে اخرجى راضية مرضية الى روح الله وريحان الله অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট---এমতাবস্থায় তুমি এ দেহ থেকে বের হয়ে আস। এই বের হওয়া হবে আল্লাহ্‌র রহমত এবং জান্নাতের চিরন্তন সুখের দিকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ আয়াতখানি

পাঠ করলাম। হযরত আবু বকর (রা) মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! এটা কি চমৎকার সম্বোধন ও সম্মান প্রদর্শন! রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ শুনে রাখুন, মৃত্যুর পর ফেরেশতা আপনাকে এই সম্বোধন করবে।---(ইবনে কাসীর)

কয়েকটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঃ হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা) বলেনঃ তায়েফ নগরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ইন্তিকাল হয়। জানাযা প্রস্তুত হওয়ার পর সেখানে একটি পাখী এসে উপস্থিত হল যার অনুরূপ পাখী কখনও দেখা যায়নি। অতঃপর পাখীটি শবাধারে ঢুকে পড়ল। এরপর কেউ তাকে বের হতে দেখেনি। অতঃপর মৃতদেহ কবরে নামানোর সময় কবরের এক পাশ থেকে একটি অদৃশ্য কণ্ঠ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ--আয়াতখানি পাঠ করল। সবাই তালাশ করল কিন্তু কে পাঠ করল, তার কোন হদিস পাওয়া গেল না।----(ইবনে কাসীর)

ইমাম হাফেয তিবরানী 'কিতাবুল আজায়েব' গ্রন্থে ফাত্তান ইবনে রুযাইনের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। ফাত্তান ইবনে রুযাইন বলেনঃ একবার রোমদেশে আমরা বন্দী হয়ে সেখানকার বাদশাহের সামনে নীত হলাম। এই কাফির বাদশাহ্ আমাদের উপর তার ধর্ম অবলম্বন করার জন্য জোর-জবরদস্তি চালাল। সে বললঃ যে কেউ আমার ধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করবে, তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে তিন ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে ধর্মত্যাগী হয়ে বাদশাহের ধর্ম অবলম্বন করল। চতুর্থ ব্যক্তি বাদশাহের সামনে নীত হল। সে তার ধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করল। সেমতে তার গর্দান কেটে মস্তকটি নিকটবর্তী একটি নহরে নিক্ষেপ করা হল। তখন মস্তকটি পানির গভীরে চলে গেল বটে কিন্তু পরক্ষণেই পানির উপরে ভেসে উঠল এবং তাদের দিকে চেয়ে প্রত্যেকের নাম নিয়ে বলতে লাগল, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي এরপর মস্তকটি আবার পানিতে ডুবে গেল।

উপস্থিত সবাই এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখল ও শুনল। সেখানকার খৃস্টানরা এ ঘটনা দেখে প্রায় সবাই মুসলমান হয়ে গেল। ফলে বাদশাহের সিংহাসন কেঁপে উঠল। ধর্মত্যাগী তিন ব্যক্তি আবার মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর খলীফা আবু জাফর মনসুর আমাদেরকে বাদশাহ্র কবল থেকে মুক্ত করে আনেন।---(ইবনে কাসীর)
